

নীতিমালা চাই শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়

মাসরুরুল হক তানভীর

ছুকাল পূর্বেও দেশের সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল মেধাবী শিক্ষার্থীরাই খেলাধুলা, বিতর্ক এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তাদের সফল পদচারণা ছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রায় ৯০% মেধাবী শিক্ষার্থীকে শ্রেণিকক্ষ, প্রাইভেট, কোচিং সেন্টার ও পড়ার টেবিলের বাহিরে কদাচিৎ দেখা যায় না। নির্দিষ্ট গতির বেড়াভাজন হতে মুক্ত হয়ে খেলার মাঠে বা বিদ্যালয়ের আঙিনায় কিছু সময় কাটিয়ে নির্মল আনন্দ উপভোগ করার কোনো সুযোগই যেন তাদের হয়ে উঠছে না। এতে শিক্ষার্থীদের যে শুধু শারীরিক সমস্যা হচ্ছে তাই নয়, মানসিকভাবেও অনেক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ছে। বর্তমানে প্রায় প্রতিষ্ঠানেই দেখা যায়, বিদ্যালয়ে প্রাত্যহিক সমাবেশ সঠিক ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। ১০-১৫ মিনিট সমাবেশে দাঁড়িয়ে থাকার পরেই অনেক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সমাবেশ শেষ করতে হয়। এ দৃশ্য হলো যেসকল প্রতিষ্ঠানে প্রাত্যহিক সমাবেশ করার মতো উপযুক্ত মাঠ রয়েছে। এছাড়া জেলা ও বিভাগীয় শহরের অনেক প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে আবাসিক বাসা-বাড়িতে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের দৃশ্য চিড়িয়াখানার বন্দী জীবজন্তুদের চেয়েও করুণ ও মর্মান্বহ। চিড়িয়াখানার প্রাণীরা ছুটাছুটি করতে পারে, সন্তানরা মা-বাবার সংস্পর্শ পায়, সময়মত খাবার পায় কিন্তু এসকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই এ ধরনের সুযোগ হতে বঞ্চিত। আর এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে তাদের দেহ-মনের উপর।

বাস্তবে শিক্ষার্থীরা শারীরিক ও মানসিক বিকাশে কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে বলে মনে হয় না। কেননা, বর্তমানে প্রথম শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৯০% শিক্ষার্থী কোনো না কোনো কোচিং সেন্টারের সাথে জড়িত। এছাড়া, কমপক্ষে দুই তিনটি বিষয় প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে পড়ছে। এর বাহিরে, বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষার দৃষ্টান্ত, সিলেবাসের ব্যাপকতা, অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তকের বোঝা এবং অভিভাবকদের পক্ষ হতে ভালো ফলাফলের চাপতো রয়েছেই। একজন শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা সময় দিয়ে তার পূর্বে বা পরে প্রাইভেট ও কোচিং সেন্টারে ট্রাস করার পর শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে কোনো কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ কোথায়? অথচ, জাতীয় শিক্ষানীতি

২০১০-এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অবস্থাদুস্তে মনে হচ্ছে আমরা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সকলেই ভালো ফলাফলের পিছনে ছুটছি। কোমলমতি এসকল শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের আমরা কোনো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছি বলে মনে হয় না।

শিক্ষার অভাবে যেমন মানুষ মূর্থ হয়, তেমনি সচেতনতার অভাবে মানুষ রোগাক্রান্ত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির



অগ্রগতির এ পর্যায়ে এসেও যদি আমরা আমাদের কোমলমতি শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে সচেতন হতে না পারি, তাহলে এ ব্যর্থতার দায়ভার কে বহন করবে? এ ধরনের অসুস্থ মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপর যখন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পড়বে তখন শারীরিকভাবে দুর্বল এ মানবসম্পদ নিজেদের সেবাই কী করবে, আর জাতিকেই কী সেবা দিবে?

কেবল, অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের মধ্যে জীবনকে আবদ্ধ করে রাখলে সে জীবন পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় না। তাই, অত্যাবশ্যক শিক্ষার সঙ্গে স্বাধীন ও আনন্দময় পাঠ না মেশালে শিক্ষার্থীদের মানসিক অগ্রগতি সাধিত হবে না। শরীর ও মনের যৌথ শৃঙ্খলাই জীবনকে শৃঙ্খলার পথে পরিচালিত করে।

শারীরিক দুর্বলতা মানসিক দুর্বলতার সুযোগ করে দেয়। এতে শরীরের স্বাভাবিক বিকাশ যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি জীবনে যোগ্যতারও ঘাটতি দেখা দেয়।

বলিষ্ঠ দেহ, আনন্দ উচ্ছল মন, গৌরবদীপ্ত প্রাণচাক্ষু প্রজন্ম ও শিশু কিশোরদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়ে সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে উলতে হলে, পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের ক্রীড়া-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে।

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কিছু পরামর্শ দেয়া হলো: ১. সপ্তাহে একদিন দুই পিরিয়ডের পর প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে। ২. শিক্ষার্থীদের কাঁধে বইয়ের বোঝা কমাতে হবে। ৩. অতিরিক্ত বই সংক্রান্ত NCTB কর্তৃক প্রণীত আইন-১৯৮৩ ধারা-১৫.১ এর বিধান বাস্তবায়ন করতে হবে। ৪. প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা উঠিয়ে দিতে হবে। ৫. ১ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ধারাবাহিক মূল্যায়ন হবে এবং বৎসর শেষে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ৬. সিলেবাসের পরিধি কমাতে হবে। ৭. খণ্ডিত কিছু বিষয়কে একত্রিত করে পাঠ্যবইয়ের সংখ্যা কমাতে হবে। ৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যকর টিফিন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। ৯. প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন অস্বাস্থ্যকর খাবারের দোকান উঠিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। ১০. শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত খেলার সুযোগ-সুবিধা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি দেওয়া যাবে না। ১১. প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারি নীতিমালার আওতায় পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে। ১২. শিক্ষা আইন ২০১০ এর আলোকে প্রাইভেট ও কোচিং সেন্টার নীতিমালা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ১৩. ভালো ফলাফলের জন্য অভিভাবকগণ শিশুদের উপর যেন অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ না করেন সেজন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অভিভাবক সমাবেশ ডেকে কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। ১৪. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে স্কাউট গার্ল গাইডস ও বিএনসিসি কার্যক্রম চালু করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীকেই এসকল সংগঠনের আওতায় আনতে হবে।

● লেখক : পি.এইচ.ডি (গবেষক), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
e-mail: tmasrurul@gmail.com